ভারতবর্ষে মোগল শাসনের প্রতিষ্ঠা: বাবর ও হুমায়ুন

ইউনিট ১

ভূমিকা

ষোল শতকের প্রথম দিকে ভারতবর্ষের অরাজক রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর এদেশে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মাত্র চার বছর রাজত্ব করেন। রাজত্বকালের পুরো সময়েই তিনি যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন। তাই তিনি বংশধরদের জন্য একটি সুসংগঠিত রাজ্য রেখে যেতে পারেন নি। এ কারণে হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করার পরই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। দিল্লির সিংহাসন তাঁর হাত-ছাড়া হয়ে যায়। তবে দীর্ঘ পনের বছর পর হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসন পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়েছিলেন।

বাবরের ভারতবর্ষ আক্রমণের প্রাক্কালে এদেশের রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল, কিভাবে বাবর এদেশে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁর পুত্র হুমায়ুনের শাসন কেমন ছিল তা এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে আলোচিত হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

পাঠ-১.১ মোগল বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের অবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মোগল বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ দিতে পারবেন।
- তৎকালীন ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মোগল বিজয়ের প্রাক্কালে এদেশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজন্যবর্গের অন্তর্দ্বন্দ্বের বর্ণনা দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	ক্ষুদ্র রাজ্য, ইব্রাহিম লোদী, রাজপুত, মোগল

মধ্য এশিয়া থেকে রাজ্যজয়ের নেশায় বেরিয়েছিলেন বাবর। ১৪১৪ সালে কাবুল অধিকারের পর বাবর ভারত বিজয়ের পরিকল্পনা করেন। ১৫১৯ সালে ভারত অভিযানের পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়। এসময় ভারতের শাসন ক্ষমতায় ছিলেন লোদী সুলতানরা। ভারতের পথে ছোট খাট আরো কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করতে কয়েকটি বছর কেটে যায়। বাবরের আক্রমণের পূর্বে ভারতের শেষ সুলতান ছিলেন ইব্রাহিম লোদী (১৫১৭-২৫ খ্রি.)। দিল্লি ও আশেপাশের অঞ্চলগুলোর উপর তাঁর অধিকার ছিল। ইব্রাহিম লোদী খুব দক্ষ শাসক ছিলেন না। সামন্ত রাজা ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অনেকেই তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিল না। তাছাড়া ভারতবর্ষের হিন্দু রাজন্যবর্গ ও রাজপুতদের সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত করতে পারেন নি দিল্লির সুলতানগণ। ফলে তুঘলক বংশের শাসনের (১৩২০-১৪১৩) শেষের দিকে দিল্লির কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এ কারণে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের উত্থান ঘটে। ভারতে সুদূর দক্ষিণে বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্য, উত্তর ভারতে কাশ্মীর ও জৌনপুর রাজ্য, পূর্বাঞ্চলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা এবং পশ্চিমে পাঞ্জাব, মালব ও গুজরাটে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজাগণ ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও

স্বাধীনতা প্রিয়। এদের সাথে বিরোধের ফলে দিল্লির কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল ও সংকুচিত হয়ে পড়ে। ভারতের কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে বাবর এদেশে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বাবরের ভারত বিজয়ের প্রাক্কালে পাঞ্জাবে দৌলত খান লোদী স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন। দিল্লির সুলতান ইব্রাহিম লোদী দৌলত খানের স্বাধীন শাসনের বিরোধিতা করায় উভয়ের মধ্যে দারুণ শত্রুতা দেখা দেয়। সুলতান ইব্রাহিম লোদীর খালাত ভাই আলম খান লোদী বিদ্রোহী দৌলত খান লোদীর সাথে যোগ দিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। বিহারের শাসনকর্তা দরিয়া খান ও দৌলত খানের সাথে যোগদান করেন। তাঁরা দিল্লির লোদী শাসনের অবসানের জন্য কাবুলে অবস্থানরত বাবরকে ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান।

দিল্লির লোদী সাম্রাজ্যের বাইরে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। এগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল মালব। মালব রাজ্যটি ছিল রাজপুতনা ও বুন্দেলখণ্ডের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। ফিরোজ তুঘলকের রাজত্বকালে (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রি.) মালব স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৬ শতকে মালবের সুলতান দ্বিতীয় মুহম্মদ শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে তাঁর রাজপুত সামন্তরা ক্ষমতা দখল করে নেয়। সামরিক দিক থেকে মালবের অবস্থান ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া গুজরাটেও একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। এ রাজ্যটি ছিল সমৃদ্ধশালী। গুজরাটের বন্দর থেকে বহু পণ্য পশ্চিম এশিয়ায় রপ্তানি হতো। এ জন্য পর্তুগিজ বণিকরা গুজরাটের উপকূলে আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করে। গুজরাটের সুলতান শেষ পর্যন্ত পর্তুগিজদের দমন করতে সক্ষম হন। রাজপুতনায় অনেকগুলো স্বাধীন রাজ্য ছিল। দিল্লির সুলতানের দুর্বলতার সুযোগে এসব রাজ্য শক্তিশালী হয়ে উঠে। এই রাজ্যগুলোর মধ্যে মেবার ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। সংগ্রাম সিংহ বা রানা সংগ্রাম সিংহ ছিলেন মেবারের শাসনকর্তা। তিনি রাজপুতদের নেতা ছিলেন। মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তৃত ছিল। ইব্রাহিম লোদীর দুর্বলতার সুযোগে সংগ্রাম সিংহ দিল্লি অধিকারের ইচ্ছা পোষণ করেন।

দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগর রাজ্যের রাজা কৃষ্ণদেব খুব উচ্চাভিলাষী ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে নিজ প্রভুত্ব স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ করলে বাহমনী রাজ্যের সাথে তাঁর সংঘাত শুরু হয়। অন্যদিকে উত্তর ভারতে কাশ্মীর রাজ্যেও তখন গোলযোগপূর্ণ অবস্থা বিরাজমান ছিল। পূর্ব ভারতের বাংলায় সুলতান হুসেন শাহের পুত্র নুসরত শাহ রাজত্ব করতেন। তাঁর রাজ্য সীমানা বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ। এদেশে কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতা রাজনৈতিক অস্থিরতার মূল কারণ। এমন পরিস্থিতি বাবরের জন্য সুযোগ এনে দেয়। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমন অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে তিনি চূড়ান্ত আক্রমণ পরিচালনা করেন। আক্রমণ করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ মধ্যযুগের ভারতের একটি মানচিত্র অংকন করবে এবং এতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোর অবস্থান বিভিন্ন রঙে চিত্রিত করবে

সারাংশ

বাবরের ভারতবর্ষ আক্রমণের প্রাক্কালে এদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজমান ছিল। তখন দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শাসক ছিলেন ইব্রাহিম লোদী। তিনি অনেকটা দুর্বল শাসক ছিলেন। ফলে অমাত্যবর্গ ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণের উপর তার নিয়ন্ত্রণ কম ছিল। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব রাজ্যের মধ্যে পাঞ্জাবের দৌলত খান লোদী সুলতানের চরম বিরোধিতা করেন এবং ইব্রাহিম লোদীকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য বাবরকে আমন্ত্রণ জানান। এমন সংকটপূর্ণ রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে বাবর ভারত আক্রমণ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাবরের ভারত বিজয়ের প্রাক্কালে দিল্লির সুলতান ছিলেন কে?

ক) ইব্রাহিম লোদী খ) দৌলত খান লোদী

গ) আলম খান লোদী ঘ) দরিয়া খান

২। দৌলত খান লোদী কোন রাজ্যের শাসক ছিলেন?
ক) কাশ্মীর খ) মালব
গ) পাঞ্জাব ঘ) বাংলা

৩। মেবার-এর শাসনকর্তা ছিলেন কে?
ক) রাজা কৃষ্ণ দেব খ) রানা সংগ্রাম সিংহ
গ) দৌলত খান লোদী ঘ) দরিয়া খান

৪। বাবরের ভারতবর্ষ বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন কে?
ক) হুসেন শাহ খ) নুসরৎশাহ
গ) গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ ঘ) আলাউদ্দিন মাহমুদ শাহ

৫। বাবরকে ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান–
i. দৌলত খান লোদী
ii. আলম খান লোদী
iii. দরিয়া খান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

কামালউদ্দিন ছিলেন বহরমপুরের জমিদার। তার জমিদারী ছিল সমৃদ্ধশালী। এখানকার বন্দর থেকে বহু পণ্য পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ডে রপ্তানি হতো। এটা দেখে রতনপুর রাজ্যের বণিকরা বহরমপুরের উপকূলে তাদের আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করে। বহরমপুরের জমিদার শেষ পর্যন্ত উক্ত ব্যবসায়ীদের দমন করতে সক্ষম হয়।

ক. কোন দেশের অধিবাসীদের পর্তুগিজ বলা হয়? ১
খ. মোগল বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল? ২
গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে পাঠ্য পুস্তকের কোন দেশের বণিকদের আধিপত্য বিস্তারে সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. 'উক্ত বণিকরা শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হয়।' পাঠ্য পুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-১.২ বাবরের ভারত জয় ও মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাবরের বাল্যজীবন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাবরের ভারত জয়ের লক্ষ্যে পরিচালিত অভিযানের বিবরণ দিতে পারবেন।
- পানিপথ যুদ্ধে বাবরের জয়লাভের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন।
- ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও সুদৃঢ় করতে আরও যে সকল যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল তার বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাদশাহ বাবরের চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	বাবর, পানিপথ, খানুয়া, তুলঘুমা

জহিরউদ্দীন মুহম্মদ বাবর ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পিতার দিক থেকে বাবর ছিলেন বিখ্যাত তুর্কি তৈমুর লং-এর অধস্তন পঞ্চম পুরুষ এবং মায়ের দিক থেকে তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন বিখ্যাত মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খান। উপমহাদেশে বাবরের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ মোগল বংশ নামে পরিচিত হয়েছে মোঙ্গলদের সাথে তাঁর সম্পর্ক থাকার কারণেই। বাবর ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে মধ্য এশিয়ার ফারগানায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ওমর মির্জা ফারগনার শাসনকর্তা ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর বাবর বার বছর বয়সে ফারগানার অধিপতি হন। তিনি তাঁর বিখ্যাত পূর্বপুরুষ তৈমুরের রাজধানী সমরখন্দ একাধিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে দখল করেন। কিন্তু অচিরেই বাবরের নিকট আত্মীয় পরিজন, রাজন্যবর্গ এবং উজবেক নেতা সাইবানি খানের বিরুদ্ধাচারণের ফলে ফারগানা ও সমরখন্দ তাঁর হাত ছাড়া হয়ে যায়। তিনি রাজ্য হারা হয়ে ভাগ্যান্বেষণে বের হন। এভাবেই এক সময় হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করেন তিনি। ১৫০৪ খ্রিস্টাব্দে উজবেক শাসনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রথম বারের মতো বাবর কাবুল জয় করেন। কাবুল বিজয়ের পরও বাবর পিতৃসিংহাসন পুনরুদ্ধার ও রক্ষায় ব্যর্থ হয়ে ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।

বাবরের ভারত অভিযান

বাবরের ভারত অভিযান আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। ঐতিহাসিকদের মতে মধ্য এশিয়ায় বাবরের যে ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছিল তা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্যই তিনি ভারত অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এ ছাড়াও ভৌগোলিকভাবে হিন্দুস্তানের অবস্থান ছিল কাবুলের পাশেই। অন্যদিকে ভারতের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ভারতীয় কোনো কোনো শাসকের আমন্ত্রণ বাবরকে ভারত আক্রমণে উৎসাহ যুগিয়েছিল। দিল্লির শাসক ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে পানিপথের যুদ্ধের পূর্বেও বাবর কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। এসব অভিযানকে প্রাথমিক অভিযান বলা হয়ে থাকে। ১৫১৯ থেকে ১৫২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাবর ভারতে তিনটি অভিযান পরিচালনা করেন। এসব অভিযানে তিনি সিন্ধুনদ অতিক্রম করে অতি সহজেই বজৌর দুর্গ, ভীরা, কুশব ও চেনাব নদীর অববাহিকা অঞ্চল দখল করেন। ১৫২৪ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান লোদী ও কয়েকজন আফগান অমাত্য বিশেষ করে আলম খানের আমন্ত্রণ জানালে বাবর তাঁর সৈন্যবাহিনীসহ পাঞ্জাবে প্রবেশ করেন এবং লাহোর, দিপালপুর ও অন্যান্য স্থান অধিকার করেন। এ বিজয়ের পর বাবর পাঞ্জাবকে কয়েকভাগে ভাগ করেন এবং দৌলত খানের পুত্র দিলওয়ার খান, ইব্রাহিম লোদীর চাচা আলম খান এবং মোগল আমীরদেরকে প্রশাসনের দায়িত্ব দিয়ে কাবুলে ফিরে যান। বাবরের অনুপস্থিতিতে দৌলত খান পাঞ্জাব পুনরুদ্ধার করেন এবং আলম খান ও দিলওয়ার খানকে বিতাড়িত করেন। আলম খান বাধ্য হয়ে কাবুলে আশ্রয় নেন এবং বাবরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ফলে ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দে বাবর পাঞ্জাব অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি সহজে পাঞ্জাব জয় করেন এবং দিল্লির দিকে এগিয়ে যান। ইব্রাহিম লোদী বাবরকে পানিপথ প্রান্তরে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে বাঁধা দেন। এই বিখ্যাত পানিপথ প্রান্তরের যুদ্ধে ইব্রাহীম লোদী পরাজিত হলে প্রাথমিকভাবে বাবরের ভারত বিজয় সম্পন্ন হয়।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ, ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ

বাবর বুঝেছিলেন পানিপথের প্রান্তরের যুদ্ধে জয় লাভ করলে তাঁর দিল্লির সিংহাসনে বসার পথ সহজ হয়ে যাবে। তাই তিনি দিল্লির নিকটবর্তী পানিপথ প্রান্তরে দিল্লির লোদী বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীর সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পরেন। তারিখটি ছিল ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে ১২ এপ্রিল। বাবরের আত্মজীবনী *তুযুক-ই-বাবরী* থেকে জানা যায়, এ সময়ে তাঁর সাথে বার হাজার সৈন্য ছিল। তাছাড়া পাঞ্জাব জয়ের পর কিছু সংখ্যক অতিরিক্ত সৈন্যও তাঁর সাথে যোগদান করে। তাঁর জ্যৈষ্ঠপুত্র হুমায়ুনও তাঁর সাথে যোগ দিয়েছিলেন। অপরদিকে ইব্রাহিম লোদীর সৈন্য সংখ্যা ছিল এক লক্ষ। পানিপথ প্রান্তরে বাবর ভিন্ন রকম যুদ্ধ কৌশল গ্রহণ করেছিলেন। প্রতিরক্ষা হিসেবে পরিখা খনন করেন। আর ভারতবর্ষে প্রথমবারের মতো কামান ও গোলন্দাজ বাহিনী ব্যবহার করেন। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী পরাজিত ও নিহত হন।

যুদ্ধে বাবরের সাফল্যের কারণ

প্রথম পানিপথের যুদ্ধে বাবরের বিজয়ের মূল কারণগুলো নিম্নরুপ:

১. বাবরের সৈন্য ইব্রাহিম লোদীর সৈন্য অপেক্ষা অধিক সুশৃঙ্খল ও সুশিক্ষিত ছিল।
২. ইব্রাহিম লোদীর অস্ত্রশস্ত্র অপেক্ষা বাবরের অস্ত্রশস্ত্র ছিল অধিক উন্নতমানের।
৩. বাবর ছিলেন একজন দক্ষ সেনানায়ক। তিনি ইব্রাহিম লোদীর বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে দক্ষতার সাথে এবং উন্নত যুদ্ধ কৌশল গ্রহণ করে জয় লাভ করেন। তাছাড়া যুদ্ধ পরিচালনায় ইব্রাহিম লোদী অপেক্ষা বাবর অধিক অভিজ্ঞ ছিলেন।
৪. ইব্রাহিম লোদীর আত্মীয় স্বজনের ষড়যন্ত্র তাঁকে যেমন দুর্বল ও শক্তিহীন করে ফেলেছিল বিপরীত দিকে এই পরিস্থিতি বাবরকে যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করেছিল।
৫. বাবর প্রথম ভারতবর্ষে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আগ্নেয়াস্ত্র কামান ব্যবহার করেন। তাঁর গোলন্দাজ বাহিনী সুশৃঙ্খল ও দক্ষ ছিল।
৬. বাবর উজবেগী ও তুর্কীদের নিকট থেকে নতুন রণকৌশল শিখেছিলেন। এ কৌশলকে বলা হত 'তুলঘুমা' যুদ্ধরীতি। এ রীতি মোতাবেক তিনি যুদ্ধে পরিখা খনন, সৈন্যদের মাঝে ব্যুহ রচনা, আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার ও অশ্বারোহী দ্বারা আক্রমণ পরিচালনা করেন।

পানিপথের যুদ্ধের ফলাফল

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ যুদ্ধে বাবরের বিজয়ের ফলে ভারতের তুর্কী আফগান দীর্ঘ শাসনের (১২০৩-১৫২৬ খ্রি.) অবসান ঘটে। এ যুদ্ধের ফলে বাবর দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করে লোদী সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে মোগল বংশের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। পানিপথের যুদ্ধের ফল হিসেবে ভারতের প্রভুত্ব সম্পূর্ণরূপে না হলেও আংশিকভাবে বাবরের হাতে চলে যায়। পানিপথের যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর বাবর মোগল বাহিনীর অঙ্গ হিসাবে ভারতবর্ষে গোলন্দাজ বাহিনী প্রবর্তন করেন। এ যুদ্ধে বাবরের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। রাশব্রুক উইলিয়ামস বলেছেন যে, "পানিপথের জয় দ্বারা সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রথম পদক্ষেপ ঘটে; তখনও আফগান উপজাতিসমূহের বিরোধিতা ছিল প্রধান বাধা"। পানিপথের যুদ্ধ জয়ের পর বাবর দিল্লি ও আগ্রায় বহু ধনরত্ন হস্তগত করেন এবং এ সম্পদ বিতরণ করে তিনি সহযোগীদের সমর্থন আদায় করেন। তাছাড়া পানিপথের জয়ের পর বাবর ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে জয়ের ফলে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বাবরের অধিকারে আসে। বহু আফগান সর্দার তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন।

সুতরাং বলা যায় পানিপথের এই যুদ্ধের ফলাফলের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে দীর্ঘস্থায়ী মোগল সাম্রাজ্যের সূচনা পর্ব শুরু হলো।

খানুয়ার যুদ্ধ, ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দ

ভারতের অন্যান্য শক্তির মধ্যে রাজপুত শক্তি ছিল অন্যতম। রাজপুতানার মেবারের অধিপতি ছিলেন রানা সংগ্রাম সিংহ। সংগ্রাম সিংহ আশা করেছিলেন যে বাবর তাঁর পূর্বপুরুষের ন্যায় দিল্লি লুট করে স্বদেশে ফিরে যাবেন। তখন তিনি ইব্রাহিম লোদীর রণক্লান্ত সেনাবাহিনীকে সহজেই পরাস্ত করে মুসলিম শাসনের ধ্বংসস্তূপের উপর এক স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু পানিপথের যুদ্ধে জয় লাভের পর বাবরের ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংকল্পের কথা জেনে সংগ্রাম সিংহ একটি শক্তিশালী রাজপুত সৈন্য বাহিনী গঠন করেন। বিভিন্ন রাজ্যের নেতৃবর্গ, আজমীর, মারওয়াড়, আম্বর ও চান্দেরীর রাজপুতগণ এবং মেওয়াটের হাসান খান তাঁর দলে যোগদান করেন। প্রতিপক্ষের যুদ্ধ প্রস্তুতি দেখে বাবরের

সৈন্যগণ আতংকিত হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধ না করে কাবুলে ফিরে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠে। সেনাদলের মনোবল বৃদ্ধির জন্য বাবর দু'টি কাজ করেন। তিনি নিজের পানপাত্র ভেঙ্গে ফেলেন এবং তাঁর সোনার ও রূপার পানপাত্রগুলো বিতরণ করে দেন। বাবর সৈন্যদেরকে উদ্দীপ্ত করে মানসিক শক্তি বাড়িয়ে দেন। এভাবে তিনি রাজপুতদের মোকাবেলা করার জন্য আগ্রার পশ্চিমে খানুয়ার প্রান্তরে সৈন্য সমাবেশ করেন।

১৫২৭ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মার্চ খানুয়ার প্রান্তরে রানা সংগ্রাম সিংহ এবং বাবরের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রায় ১০ ঘন্টার যুদ্ধে রাজপুত বাহিনী অসাধারণ বিক্রম দেখালেও বাবরের রণকৌশল শেষ পর্যন্ত রাজপুতদেরকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়। বাবর এ যুদ্ধেও তুলঘুমা যুদ্ধ রীতি এবং আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারের দ্বারা রাজপুত শক্তিকে ধ্বংস করেন। সংগ্রাম সিংহ আহত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর সহযোগীরা তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে।

খানুয়ার যুদ্ধের গুরুত্ব

খানুয়ার যুদ্ধের গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী। খানুয়ার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর সংগ্রাম সিংহের ভারতে রাজপুত প্রাধান্য স্থাপনের স্বপ্ন চিরতরে বিনষ্ট হয়ে যায়। শক্তিশালী মোগলদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করার জন্য আর কোনো শক্তি রইল না। রাজপুত শক্তি পতনের ফলে আফগানরাও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। কারণ রাজপুতদের সাথে যোগ দিয়ে জোট গড়ার সম্ভাবনাও বিলীন হয়ে যায়। এ যুদ্ধে জয়ের ফলে ভারতে মোগল শক্তির ভিত্তি দৃঢ় হয় এবং বাবর কাবুল থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। অতঃপর তিনি সহজে মালবের মেদিনী রায়কে পরাস্ত করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক খানুয়ার যুদ্ধকে বক্সারের যুদ্ধের সাথে তুলনা করেছেন। কারণ ভারতে বৃটিশ শক্তির প্রাধান্য স্থাপনে বক্সার যেমন একটি নিষ্পত্তিকারী যুদ্ধ, ভারতে মোগল শক্তির উত্থানে খানুয়ার যুদ্ধও ছিল তদরূপ।

ফলাফল

১. খানুয়ার যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষে মোগল শক্তি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।
২. বাবরের ভারতবর্ষ আক্রমণকালীন সময়ে এদেশে দুইটি পরাক্রমশালী শক্তি ছিল। তাঁরা হলো আফগান ও রাজপুত। পরপর দু'টি যুদ্ধে বিজয়ের ফলে উভয় শক্তি বিনষ্ট হয়। ফলে ভারতবর্ষে মোগল শক্তির উত্থানের পথ খুলে যায়।
৩. খানুয়ার প্রান্তরে জয়লাভের পর মোগলদের কেন্দ্রীয় রাজধানী কাবুল থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়।
৪. খানুয়ার যুদ্ধে জয়লাভের পর বাবর অন্যান্য রাজপুতদেরকে পরাজিত করতে সক্ষম হন।

গোগরার যুদ্ধ, ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দ

ভারতবর্ষের দু'টি বৃহৎ শক্তি ইব্রাহিম লোদী ও রানা সংগ্রাম সিংহ বাবরের নিকট পরাজিত হলেও পূর্ব ভারতের আফগানগণ তাঁকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেন নি। বাংলার সুলতান নুসরত শাহের আশ্রয়ে আফগান সর্দারগণ পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করতে থাকেন। বিহারের শের খান, জৌনপুরের মুহম্মদ লোদী এবং নুসরৎ শাহ একযোগে দিল্লি আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। বাবরের বাহিনী দ্রুত কনৌজ, বারাণসী, এলাহাবাদ দখল করে বিহার সীমান্তে গোগরা নদীর তীরে উপনীত হলে মুহম্মদ লোদী ও শের খান বাধা দেন। কিন্তু সুশিক্ষিত মোগল বাহিনীর নিকট আফগান বাহিনী পরাজিত হয়। ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে মাহমুদ লোদী বাংলার সুলতান নাসিরুদ্দিন নুসরত শাহের শরণাপন্ন হন। কিন্তু বাবরের সঙ্গে নুসরত শাহের এক সন্ধি হয়। এর ফলে বাংলার সুলতান মোগল আফগান যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। বিনিময়ে বাবর নুসরত শাহের রাজ্য সীমা মেনে নেন এবং অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার অঙ্গীকার করেন। এ যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে ভারতবর্ষে বাবরের বিজয় অভিযান সমাপ্ত হয়। বাবর আমুদরিয়া থেকে গোগরা এবং হিমালয় থেকে গোয়ালিয়র পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগের অধিপতি হন। এভাবে ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে জহির উদ্দিন বাবর আগ্রায় ইন্তেকাল করেন।

বাবরের চরিত্র

তুর্কী ভাষায় 'বাবর' শব্দের অর্থ 'সিংহ'। বাবরের চারিত্রিক গুণাবলি ও দৃঢ়তার জন্য তাঁর এ নামকরণ যথার্থ বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন। মধ্য এশিয়ার দুই প্রধান বিজেতা তৈমুর লং ও চেঙ্গিস খানের রক্ত তাঁর দেহে প্রবহমান ছিল। বাবরের চরিত্রে উভয় নেতার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন দেখা যায়। তিনি ছিলেন মধ্য এশিয়ার একজন যাযাবর যোদ্ধা। যোদ্ধা জাতিসুলভ স্বভাব নিয়ে সমরখন্দ, আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষে ভাগ্যান্বেষণ করেন। মধ্য এশিয়ার জন্য তাঁর

ভালবাসা ছিল আন্তরিক। মধ্য এশিয়ার লোকদের স্বভাব অনুযায়ী বাবর যুদ্ধকে জীবনের এক স্বাভাবিক ধর্ম হিসেবে মনে করতেন।

জয় বা পরাজয়ে তিনি ছিলেন অবিচলিত। যুদ্ধের প্রয়োজনে চরম নিষ্ঠুরতা দেখালেও তিনি স্বভাব-নিষ্ঠুর ছিলেন না। যুদ্ধের মধ্যেও তিনি উদ্যান রচনা ও কবিতা রচনার কথা ভাবতেন। বস্তুত বাবরের হৃদয় ছিল কোমল। তিনি তাঁর পরিবারের লোকজনদেরকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি ছিলেন সাহসী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও আত্মবিশ্বাসী, বিপদে তিনি ধৈর্য হারাতেন না। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে তিনি শত্রুপক্ষের দুর্বল দিকগুলো খুঁজে বের করতেন। সঙ্গীত, কাব্য, সাহিত্যে তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে বাবর ছিলেন ফরাসি বীর নেপোলিয়নের মতো আত্মনির্ভরশীল এবং ধৈর্যশীল। ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "যোদ্ধা, শাসক ও পণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে বাবর মধ্যযুগের একজন আকর্ষণীয় ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নরপতি ছিলেন।" বাবর ছিলেন কষ্টসহিষ্ণু। রাজ্যহারা হয়ে তিনি বহু বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করেছেন। তবুও তিনি হতোদ্যম হন নি। সর্বোপরি তিনি ছিলেন স্নেহবৎসল পিতা।

শাসক হিসেবে বাবরের কৃতিত্ব

ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের স্থপতি হিসেবে বাবরের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। তিনি যদি মোগল শক্তিকে ভারতমুখী না করতেন তাহলে মধ্য এশিয়ায় হয়ত উজবেগ জাতির সাথে সংঘর্ষে তারা ধ্বংস হয়ে যেত। তিনি উত্তর ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ধ্বংস করে একক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি রাজপুত এবং আফগান শক্তিকে দুর্বল করে দিয়ে পরবর্তীকালে আকবরের সাম্রাজ্য গড়ার কাজ সহজ করেছিলেন। তিনি 'বাদশাহ' উপাধি গ্রহণ এবং সিংহাসনের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করেন। বাবরের সাম্রাজ্য পশ্চিমে কাবুল থেকে পূর্বে বিহার এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে চান্দেরী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি মাত্র চার বছর (১৫২৬-১৫৩০ খ্রি.) রাজত্ব করেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে শাসন কাঠামোর কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করতে পারেন নি। তবে তিনি বাদশাহ ও সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক দপ্তরগুলোর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেছিলেন। তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তা, দিওয়ান (রাজস্ব কর্মকর্তা), শিকদার ও কোতোয়াল বা নগরাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। তবে তিনি সামন্ত ও জায়গীরদারদের ক্ষমতা অনেকাংশে খর্ব করেন।

শিল্প ও সাহিত্যানুরাগী হিসেবে বাবরের কৃতিত্ব

বাবর শুধু একজন শাসক ও যোদ্ধাই ছিলেন না, শিল্প ও সাহিত্যের প্রতিও তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁর রচিত তুযুক-ই-*বাবরী* বা বাবরের আত্মজীবনী তুর্কী সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। বাবর দিল্লি ও আগ্রায় বেশ কয়েকটি অট্টালিকা, উদ্যান এবং পানি নিষ্কাশনের জন্য পাকা নর্দমা নির্মাণ করেছিলেন।

বাবর পরাজিত আফগান ও রাজপুতদের প্রতি আনুগত্যের বিনিময়ে মৈত্রী নীতি গ্রহণ করেছিলেন। বাবর ছিলেন মধ্যযুগের একজন আকর্ষণীয় এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নরপতি।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাবরের কৃতিত্ব নিয়ে একটি নিবন্ধ লিখুন

সারাংশ

জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বাবর পিতৃরাজ্য ফারগানা হারিয়ে অনেক চড়াই উৎরাই অতিক্রম করে কাবুলের সিংহাসন দখল করেন। কাবুল থেকে বাবর ভারতবর্ষে আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা তাঁকে এদেশ বিজয়ে উৎসাহিত করে। বাবরের এদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চল আক্রমণের প্রাথমিক সাফল্য এবং পরবর্তীকালে পানিপথ, খানুয়া ও গোগরার যুদ্ধের বিজয়ের মধ্যদিয়ে এদেশে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সম্রাট বাবর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক) তাসখন্দ খ) ফারগানা
গ) বোখারা ঘ) সমরখন্দ

২। কত খ্রিস্টাব্দে পানি পথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়?
ক) ১৫২৪ খ) ১৫২৫
গ) ১৫২৬ ঘ) ১৫২৭

৩। লোদী বংশের শেষ সুলতান কে?
ক) ইব্রাহিম লোদী খ) বাহলুল লোদী
গ) দৌলত খান লোদী ঘ) সিকান্দার লোদী

৪। কত খ্রিস্টাব্দে বাবর মৃত্যুবরণ করেন?
ক) ১৫২৬ খ) ১৫২৭
গ) ১৫২৯ ঘ) ১৫৩০

৫। পানি পথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের সাফল্যের কারণ–
i. বাবরের সৈন্য সুশৃংখল ও সুশিক্ষিত ছিল
ii. বাবরের অস্ত্র-শস্ত্র অধিক উন্নতমানের ছিল
iii. এ যুদ্ধে বাবর কামান ব্যবহার করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

জাফরের পিতা চন্দ্রদ্বীপ নামক নগর রাষ্ট্রের রাজা ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর অল্প বয়সেই জাফরকে রাষ্ট্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু অচিরেই তার নিকটাত্মীয় পরিজন, সভাসদ, আমীর ওমরাদের বিরুদ্ধাচারণের ফলে তার রাজ্য হাত ছাড়া হয়ে যায়। অনেক বার চেষ্টা করেও রাজ্য পুনরুদ্ধারে ব্যর্থ হয়ে পাশ্ববর্তী রাজ্যের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগে তা দখল করে শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

ক. তুযুক-ই-*বাবরী* গ্রন্থের রচয়িতা কে? ১
খ. 'ভারত বর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল'– ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. উদ্দীপকের জাফরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার সাথে পাঠ্য পুস্তকের কোন শাসকের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. উক্ত শাসকের সমর কৌশল বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-১.৩ হুমায়ুনের শাসনকাল (১৫৩০-১৫৪০ খ্রি. ও ১৫৫৫-১৫৫৬ খ্রি.)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সিংহাসনে আরোহণ করে হুমায়ুন যেসব বাঁধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- হুমায়ুনের সাথে শেরশাহের সংঘর্ষের কারণ ও ফলাফল উল্লেখ করতে পারবেন।
- বাহাদুর শাহের সাথে হুমায়ুনের সংঘর্ষের বিবরণ দিতে পারবেন।
- হুমায়ুনের বিপর্যয়ের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- হুমায়ুনের চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	হুমায়ুন, শেরখান, শেরশাহ, বিলগ্রামের যুদ্ধ

মৃত্যুর পূর্বে সম্রাট বাবর পুত্র হুমায়ুনকে তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচন করেছিলেন। তাই ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর মৃত্যুবরণ করলে হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসনে আরোহন করেন। বাদশাহ হুমায়ুনের শাসনামলকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায় ১৫৩০-৪০ খ্রিস্টাব্দ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৫৫৫-১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। মাঝখানে ১৫ বছর তিনি পারস্যে প্রবাস জীবনযাপন করেন।

হুমায়ুনের রাজকীয় ক্ষমতা গ্রহণের সময়ে তাঁর সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অস্থিতিশীল ও বিপদসংকুল। পূর্বদিকে আফগানগণ এবং পশ্চিমে গুজরাটের শাসক বাহাদুর শাহ মোগল প্রভুত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাড়িয়েছিল। হুমায়ুনের আপন ভাইয়েরাও নানা ধরণের সংকট তৈরি করেন। তাঁর ভগ্নিপতি মুহম্মদ জামান মির্জা এবং চাচাতো ভাই মুহম্মদ সুলতান মির্জারও দিল্লির সিংহাসনের প্রতি দৃষ্টি ছিল। বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে গঠিত মোগল সৈন্যবাহিনী কিছুটা বিশৃঙ্খল হয়ে পরেছিল। এমন দুর্বল অবস্থা থেকে উত্তরণে ব্যর্থ হলে হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসনচ্যুত হন।

হুমায়ুনের সাথে বাহাদুর শাহের সংঘর্ষ

সিংহাসনে আরোহণের ছয় মাসের মধ্যে হুমায়ুন কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করেন। তবে বিহারের শাসনকর্তা মাহমুদ লোদী বিদ্রোহ করলে তিনি অবরোধ উঠিয়ে ফেলেন এবং বিহার আক্রমণ করে মাহমুদ লোদীকে পরাস্ত করেন। হুমায়ুন এ বিজয়ের পর আফগান নেতা শের খান সুরের চুনার দুর্গ অবরোধ করেন। শেরখান হুমায়ুনের বশ্যতা স্বীকার করলে তিনি (হুমায়ুন) আগ্রায় ফিরে আসেন। কিছু দিনের মধ্যে পূর্বাঞ্চলে শের খান এবং গুজরাটে বাহাদুর শাহ তাঁদের নিজ নিজ শক্তি বৃদ্ধি করে। এ সংবাদে বাদশাহ শংকিত হয়ে পূর্বাঞ্চলের পরিবর্তে গুজরাটে বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন।

গুজরাট কাথিয়াড়ের সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত। হুমায়ুনের আমলে গুজরাটের শাসনকর্তা ছিলেন বাহাদুর শাহ। তিনি ছিলেন উচ্চাভিলাষী এবং হুমায়ুনের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। আফগান বিদ্রোহীদের আশ্রয়দান এবং সাহায্য প্রদান করে তিনি হুমায়ুনের বিরাগভাজন হন। তাছাড়া মালব, রণথম্ভোর, রাজপুতনা ও চিতোর বিজয়ের পরিকল্পনা করলে তাঁর সাথে হুমায়ুনের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। হুমায়ুন বিদ্রোহী আমীরদেরকে ফেরত চেয়ে বাহাদুর শাহের সাথে আপোস মীমাংসার চেষ্টা করেন। কিন্তু বাহাদুর শাহ হুমায়ুনের প্রস্তাব নাকচ করে দেন। ফলে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বাহাদুর শাহ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন আহমদাবাদে। এরপর বাদশাহ হুমায়ুন রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলে বাহাদুর শাহ গুজরাট পুনরুদ্ধার করেন। এ সময়ে পূর্বাঞ্চলে শের খান প্রভাবশালী হয়ে উঠলে বাহাদুর শাহের বিদ্রোহ দমন সম্রাটের পক্ষে আর সম্ভব হয় নি।

হুমায়ুনের সাথে শের খানের সংঘাত

শের খান ছিলেন ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে বিহার প্রদেশের আফগান নেতা। শের খান বাদশাহ বাবরের জীবদ্দশাতেই বিহারের অন্তর্গত সাসারামের সামন্ত শাসক ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি চুনার দুর্গের অধিপতি তাজ খানের বিধবা পত্নী লাদ

মালিকাকে বিয়ে করে চুনার দুর্গের অধিপতি হন। ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে বাদশাহ হুমায়ুন চুনার দুর্গ অবরোধ করলে শের খান তাঁর সাথে সন্ধি করেন এবং বাদশাহের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে নিজকে রক্ষা করেন। ইতোমধ্যে বিহারের শাসনকর্তা জামাল খান লোহানী বাংলার সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের সাহায্যে শের খানকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বীর যোদ্ধা শেরখান এই সম্মিলিত বাহিনীকে সুরাজগড়ের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। এভাবে তিনি বিহারের অধিপতি হন। অতঃপর শেরখান বাংলার প্রতি দৃষ্টি দেন। তিনি উপর্যুপরি দু'বার বাংলা আক্রমণ করে রাজধানী গৌড়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছিলেন।

বাদশাহ হুমায়ুন পূর্বাঞ্চলে শেরখানের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে কিছুটা চিন্তিত হন এবং তাঁকে দমন করার উদ্দেশ্যে ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে সসৈন্যে বাংলা অভিমুখে যাত্রা করেন। বাংলার পথে হুমায়ুন চুনার দুর্গ আক্রমণ করে অধিকার করে নেন। চুনার দুর্গ জয় করে হুমায়ুন দীর্ঘ ছয় মাস বাংলায় অতিবাহিত করেন। এ সুযোগে শের খান বানারস ও জৌনপুর অধিকার করেন।

সুচতুর শেরখান হুমায়ুনের সাথে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ না হয়ে তাঁর পিছু ধাওয়া করেন। তিনি বিহার ও জৌনপুরে মোগল অধিকৃত অঞ্চল দ্রুত অধিকার করে কনৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হন। শের খান দিল্লির সাথে বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেন। ফলে হুমায়ুন আতংকিত হয়ে পড়েন এবং কাল বিলম্ব না করে সসৈন্যে আগ্রার দিকে যাত্রা করেন। পথে গঙ্গা নদীর তীরে চৌসা নামক স্থানে শেরখান তাঁর গতিরোধ করেন। এই দুঃসময়ে হুমায়ুন তাঁর ভাইদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে ব্যর্থ হন। অবশেষে তিনি মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে শেরখানের সাথে যুদ্ধ শুরু করেন। এ যুদ্ধে ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন পরাজিত হন। হুমায়ুনের সৈন্য বাহিনী আত্মরক্ষার জন্য গঙ্গা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এতে অনেকের সলিল সমাধি ঘটে। হুমায়ুন কোনো রকমে গঙ্গা পার হয়ে প্রাণ বাঁচান এবং আগ্রায় পৌঁছেন। কথিত আছে যে তিনি যখন গঙ্গায় নিমজ্জিত হওয়ার উপক্রম হন তখন নিজাম নামে এক ভিস্তিওয়ালা তাঁকে প্রাণে রক্ষা করেন। তিনি তাঁর প্রাণরক্ষাকারীকে বিপুল সম্মানে ভূষিত করেন এবং একদিনের জন্য দিল্লির সিংহাসনে বসান। এই যুদ্ধ জয়ের ফলে বাংলা, বিহার, জৌনপুর, কনৌজ শেরখানের হস্তগত হয়। তাঁর শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তিনি ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে. 'শেরশাহ' উপাধি ধারণ করে রাজকীয় মর্যাদায় নিজেকে ভূষিত করেন। তিনি নিজের নামে খুৎবাহ পাঠ ও মুদ্রা ইস্যুর ব্যবস্থা করেন।

বিলগ্রামের যুদ্ধ (১৫৪০ খ্রি.)

চৌসার যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি এবং ব্যর্থতার বেদনা সহ্য করতে না পেরে হুমায়ুন পুনরায় ভাইদের নিকট সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় সাহায্য তিনি পান নি। তাই তিনি মাত্র চল্লিশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে শেরশাহকে বাধা দেয়ার জন্য কনৌজের পথে অগ্রসর হন। অপর পক্ষে শেরশাহের সৈন্য সংখ্যা ছিল পনের হাজার। তিনি এ সৈন্য নিয়ে ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মে কনৌজের অদূরে বিলগ্রামে হুমায়ুনের মুখোমুখী হন। উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বিলগ্রামের যুদ্ধে হুমায়ুন পুনরায় শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে আগ্রার পথে পলায়ন করেন। শেরশাহ দ্রুত দিল্লি, আগ্রা অধিকার করে নিলে হুমায়ুন পারস্যের দিকে পলায়ন করেন। এ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ভারতে সাময়িকভাবে মোগল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে এবং শেরশাহের নেতৃত্বে আফগান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

শেরশাহের সাফল্য ও হুমায়ুনের ব্যর্থতার কারণ

শেরশাহের সাফল্য ও হুমায়ুনের ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করা যায়:

১. **শেরশাহের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও সামরিক দক্ষতা**- শেরশাহ ছিলেন কৌশলী ও দূরদর্শী শাসক। তিনি হুমায়ুনকে গৌড় জয় করতে সুযোগ দিয়ে কৌশলে নিজের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির কাজ সম্পন্ন করেন। অন্যদিকে হুমায়ুনের দূরদর্শিতার অভাব ছিল। চুনার এবং পরে গৌড়ে অযথা কালক্ষেপণ তাঁর অদূরদর্শিতা প্রমাণ করে।

২. **বাবরের সাম্রাজ্যের সাংগঠনিক দুর্বলতা**- বাবর যে সাম্রাজ্য ও শাসন ব্যবস্থা রেখে যান তা এত দুর্বল, কাঠামোহীন ও ভঙ্গুর ছিল যে হুমায়ুনের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। বাবর রাজকোষ শূন্য রেখে যান এবং তিনি সুষ্ঠু রাজস্ব ব্যবস্থা কায়েম করে যেতে পারেন নি।

৩. **সেনাবাহিনীর সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য**- শেরশাহের সেনাবাহিনী যুদ্ধ নিপুণ সৈন্য দ্বারা সুগঠিত ছিল। কিন্তু হুমায়ুনকে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি সৈন্য সংগ্রহ করতে হয়েছিল বলে তিনি সৈন্য বাহিনীকে সুগঠিত করার সময় ও সুযোগ পান নি।

৪. **হুমায়ুনের চারিত্রিক দুর্বলতা**- হুমায়ুন ছিলেন দুর্বল চিত্তের অধিকারী। তিনি তাঁর ভাইদের প্রতি কোমলতা দেখিয়ে পরে অনুতাপ করতে বাধ্য হন। ঐতিহাসিক লেনপুল বলেছেন যে হুমায়ুনের চরিত্রে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, জেদ ও অধ্যবসায়ের অভাব ছিল। তিনি কোনো বিষয়ে আংশিক সফলতার পর আমোদ প্রমোদে অযথা সময় ব্যয় করতেন।

৫. **হুমায়ুনের ভাইদের বিরোধিতা**- হুমায়ুনের তিন ভাই কামরান, হিন্দাল এবং আশকারী বিপদের সময়ে হুমায়ুনকে কোনোরূপ সাহায্য করেন নি। ফলে একা হুমায়ুনের পক্ষে দিল্লির সিংহাসন রক্ষা করা সম্ভব হয় নি।

৬. **আফগানদের নিরঙ্কুশ সমর্থন**- শেরশাহের প্রতি আফগানদের পূর্ণ সমর্থন ছিল। অন্যদিকে হুমায়ুন তাঁর আপনজনের সমর্থন থেকেও বঞ্চিত হয়েছিলেন। ফলে হুমায়ুন সিংহাসনচ্যুত হন এবং ভারতের ভাগ্যাকাশে ধুমকেতুর মতো শেরশাহের আবির্ভাব ঘটে।

হুমায়ুনের দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ

শেরশাহের নিকট পরাজিত হয়ে হুমায়ুন বহু দুঃখ দুর্দশার মধ্যদিয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। যোধপুরে আশ্রয় লাভে ব্যর্থ হয়ে তিনি অমরকোটে রানা প্রসাদের আশ্রয় প্রার্থী হন। রানা প্রসাদ তাকে আশ্রয় দেন এবং সিন্ধু ও খাট্টা পুনরুদ্ধারে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন। অমরকোটে থাকা অবস্থায় হুমায়ুনের স্ত্রী হামিদা বানুর গর্ভে পুত্র আকবরের জন্ম হয়। রানা প্রসাদের সাথে হুমায়ুনের মত বিরোধ দেখা দিলে তিনি হুমায়ুনকে সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। হুমায়ুন আশ্রয়ের আশায় কান্দাহারে ভাই আশকারীর স্মরণাপন্ন হন। কিন্তু আশকারী সম্মত না হওয়ায় তিনি শিশু পুত্র আকবরকে কান্দাহারে রেখে পারস্য অভিমুখে রওনা হন। ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে পারস্যে পৌঁছলে সম্রাট শাহ তামসপ হুমায়ুনকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানান। পারস্য সম্রাটের সাথে সম্পাদিত এক চুক্তি অনুসারে হুমায়ুনকে বোখারা, কাবুল, কান্দাহার ও তাঁর ভারতে মোগল রাজ্য পুনরুদ্ধারে সেনাবাহিনী ও অর্থ দিয়ে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। বিনিময়ে হুমায়ুন শাহ তামসপকে কান্দাহার ফিরিয়ে দিতে এবং শিয়া ধর্মমত গ্রহণ করতে রাজী হন।

হুমায়ুনের রাজ্য পুনরুদ্ধার

পারস্য সম্রাটের সহায়তায় হুমায়ুন তাঁর ভাইদের পরাজিত করে কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করেন। কান্দাহার থেকে শিশুপুত্র আকবরকে উদ্ধার করা হয়। ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বাসী সেনাপতি বৈরামখানের সহায়তায় হিন্দুস্তান পুনরুদ্ধারে অগ্রসর হন। ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে সিকান্দর শূরকে পরাজিত করে পাঞ্জাব দখল করেন। দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করে তিনি মোগল শাসন পুনপ্রতিষ্ঠা করেন। তবে তিনি বেশি দিন রাজ্য ভোগ করতে পারেন নি। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি হুমায়ুন দিল্লিতে তাঁর পাঠাগারের সিঁড়ি হতে পড়ে গিয়ে আকস্মিক মৃত্যু বরণ করেন।

হুমায়ুনের চরিত্র ও কৃতিত্ব

হুমায়ুন শান্ত স্বভাব, দয়ালু ও বাৎসল্য প্রবণ ছিলেন। তাঁর মধ্যে মমত্ববোধও ছিল অপরিসীম। সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতার মতো দুর্লভ গুণও তাঁর মধ্যে ছিল। তিনি ছিলেন শিক্ষিত, মার্জিত ও শিষ্টাচার সম্পন্ন। এছাড়াও তাঁর মধ্যে সমরদক্ষতা ও সাহসিকতারও অভাব ছিল না। তবে তাঁর মধ্যে বিচক্ষণতা ও রাজনৈতিক দুরদর্শিতার অভাব ছিল। নব প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য রক্ষা করার এবং আফগানদের বিরোধিতা মোকাবেলা করে সাম্রাজ্যের সংহতি বিধান করার জন্য প্রয়োজনীয় দুরদর্শিতা, কুটকৌশল ও ধৈর্য্য তাঁর ছিল না। ঐতিহাসিক লেনপুল এর মতে, হুমায়ুনের চরিত্র ছিল আকর্ষণীয়, কিন্তু প্রভাবশালী নয়। ব্যক্তি জীবনে হয়ত মনোরম সঙ্গী ও বিশ্বাসী বন্ধু ছিলেন কিন্তু সম্রাট হিসেবে ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ সম্রাট হুমায়ুনের দেশ-দেশান্তরের উপর মানচিত্রসহ একটি রচনা তৈরি করবেন।

সারাংশ

সম্রাট বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। হুমায়ুন আফগানদের সাথে বিশেষ করে শেরখানের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দিল্লির সিংহাসন হারান। পরবর্তীকালে দীর্ঘ পনের বছর পর ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি দিল্লির সিংহাসন পুনরুদ্ধার করলেও বিজয়ের সুফল ভোগ করতে পারেন নি। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি তিনি

পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। হুমায়ন কত খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সিংহাসন বসেন?
ক) ১৫২৫ খ) ১৫৩০
গ) ১৫৩৫ ঘ) ১৫৪০

২। হুমায়ুন প্রবাস জীবনযাপন করেন–
ক) ১৫ বছর খ) ১৬ বছর
গ) ১৮ বছর ঘ) ২০ বছর

৩। হুমায়ুনের শাসনামলে বাংলার রাজধানী কোথায় ছিল?
ক) মুর্শিদাবাদ খ) গৌড়
গ) ঢাকা ঘ) লক্ষ্মনাবতী

৪। হুমায়ুনের শাসনামলে গুজরাটের শাসক ছিলেন কে?
ক) মাহমুদ শাহ খ) বাহাদুর শাহ
গ) জামাল খান ঘ) শেরখান

উদ্দীপকটি পড়ে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

কবির উদ্দিন ছিলেন জোতদার। প্রতিপক্ষের হাতে জমি জমা সব হারিয়ে দীর্ঘদিন তিনি এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ান। অবশেষে বন্ধুদের সহায়তায় জোতদারী উদ্ধার হলেও হঠাৎ মৃত্যুবরণ করায় বেশি দিন ভোগ করতে পারেন নি।

৫। উদ্দীপকের কবির উদ্দিনের সাথে কোন মোগল শাসকের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়?
ক) বাবর খ) হুমায়ুন
গ) আকবর ঘ) জাহাঙ্গীর

৬। উক্ত শাসক আশ্রয় নিয়েছিলেন–
i. অমরকোটে
ii. কান্দাহারে
iii. পারস্যে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

ক একটি রাষ্ট্রের সম্রাট ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর অল্প বয়সেই তাকে রাষ্ট্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু অচিরেই তার নিকটাত্মীয় পরিজন, সভাসদ, আমীর ওমরাদের বিরুদ্ধাচারণের ফলে তার রাজ্য হাত ছাড়া হয়ে যায়। অনেক বার চেষ্টা করেও রাজ্য পুনরুদ্ধারে ব্যর্থ হয়ে পাশ্ববর্তী রাজ্যের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগে তা দখল করে শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

ক. সম্রাট হুমায়ুন কে ছিলেন? ১
খ. বিলগ্রামের যুদ্ধ কেন হয়? ২
গ. হুমায়ুনকে কেন এদেশ থেকে সে দেশ পালিয়ে বেড়াতে হয়? ৩
ঘ. হুমায়ুনের ব্যর্থতা ও শেরশাহের সাফল্যের কারণ কী? ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১ ঃ ১। ক ২। গ ৩। খ ৪। খ ৫। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ক ৪। ঘ ৫। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩ ঃ ১। খ ২। ক ৩। খ ৪। খ ৫। খ ৬। খ